চীন : পরাশক্তির বিবর্তন-৬

আনু মুহাম্মদ

পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় চীন এখন শক্তিশালী ভূমিকায়, তার অর্থনৈতিক প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। 'বেল্ট এন্ড রোড' কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তার উপস্থিতি এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে। আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ঋণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে চীন সাম্রাজ্যবাদী বিশেষণেও অভিহিত হচ্ছে। ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে (পিপিপি) বিচার করলে চীন এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। আর প্রচলিত জিডিপি বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের পরই চীন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। চীন ঘিরে অনেক প্রশ্ন। এই চীন তার বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে বিপ্লব করেছিল? বিপ্লবের পর চীনের অগ্রযাত্রা কীভাবে ঘটেছে? সম্প্রতি চীনের দ্রুত বিস্ময়কর অর্থনৈতিক গতির রহস্য কী? দেশের ভেতর বৈষম্য, দুর্নীতি বৃদ্ধি, বিশাল ধনিক গোষ্ঠীর প্রবল আধিপত্য ইত্যাদির সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একক শাসন কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ? কথিত বাজার সমাজতন্ত্রেরই বা স্বরূপ কী? বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এর তাৎপর্য কী? এসব বিষয় পর্যালোচনা করতে করতেই এই লেখা অগ্রসর হচ্ছে। কয়েক পর্বে প্রকাশিতব্য এই লেখার ষষ্ঠ পর্বে চীনা বিপ্লব-উত্তর কমিউনসহ নানা ব্যবস্থা ভেঙে ভিন্ন অর্থনৈতিক যাত্রা, তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের সংঘাত, উঁচু প্রবৃদ্ধির সূচনা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কমিউনে আঘাত

১৯৮০ থেকে দেং এর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি বৃদ্ধি পায়। দেশের ভেতরে সংস্কারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দরকষাকষির তৎপরতাও বাড়ে। বৃটেনের সাথে অনেক দেনদরবারের পর হংকং পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হয়। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তে চীন ও যুক্তরাজ্যের যৌথ ঘোষণায় ১৯৯৭ সালের মধ্যে হংকংকে ফেরত দেবার ঘোষণা আসে। 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা' নীতি তখনই ঘোষিত হয়। একই নিয়মে পর্তুগালের কাছ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে ম্যাকাও দ্বীপপুঞ্জ ফেরত পাবার ব্যবস্থা হয়। 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা' একটি নতুন উদ্ভাবন, যার ভিত্তিতে হংকং এখনও পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি হংকংএ দীর্ঘ প্রতিবাদ চলছে অধিকতর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য। তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ হংকংএ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আহবান জানাচ্ছে!

১৯৭০ দশকের শেষ থেকেই দেশের ভেতর অর্থনৈতিক সংস্কারের যেভাবে যুক্তি বিন্যাস করা হয় তা থেকে দুটি নতুন ধারণা-শব্দমালার ব্যবহার শুরু হয়। এগুলো হল: চীনের বৈশিষ্ট্যে সমাজতন্ত্র (socialism with Chinese characteristics) এবং সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি (socialist market economy)। যুক্তি ছিল চীন সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরে আছে, এখন প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন, আধুনিকীকরণ, সমৃদ্ধি। এর জন্য বাজার, প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি মালিকানা, বিদেশি বিনিয়োগ, রপ্তানিমুখী বিকাশ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সবই ব্যবহার করতে হবে। বলা হলো, কেউ ধনী হলে কোনো ক্ষতি নেই বরং সকলেরই লাভ। পূর্ব এশিয়ার দ্রুত শিল্পায়িত দেশগুলো একভাবে মডেল হিসেবে সামনে ছিল বলে অনেকের ধারণা ।

সংস্কারের প্রথম পর্যায়েই আক্রমণ বা দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার শিকার হয় চীন বিপ্লবের অন্যতম প্রধান স্মারক কমিউন। চীনের বিপুল জনসংখ্যা, কৃষি ভিত্তি, দুর্বল অবকাঠামোর মধ্যে দ্রুত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সকলের শিক্ষা চিকিৎসা নিশ্চিত করায় প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ, শিল্প ও কৃষির সম্মিলনের মধ্য দিয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন, সর্বোপরি জনগণের সামষ্টিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের বিকাশ সবকিছুর জন্য কমিউন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৮৪ সালে,এই সংস্কার কর্মসূচির প্রথম দিকে, চীনে বিপ্লবী রূপান্তরের শক্তি ও সমস্যা সম্পর্কে আমি 'চীনে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী সংগ্রাম' শীর্ষক লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। তাতে কমিউন ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এবং উৎপাদন সম্পর্ককে বিপ্লবীকরণের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নির্দিষ্ট করেছিলাম। বিভিন্ন তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে তাতে দেখিয়েছিলাম, কমিউন ব্যবস্থায় '(১) ক্ষুদে উৎপাদনের শর্তাবলী উৎখাত করে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রবর্তিত হয়েছিল। যার ফলে উন্নতমানের চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় এবং উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। (২) ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে সমষ্টিগত অংশগ্রহণে উন্নীত করা হয়েছিল। (৩) ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজিক মালিকানায় উন্নীত করা হয়েছিল। (৪) সমষ্টিগত ও বৃহদায়তন উৎপাদনের এই পদ্ধতি চালু হবার ফলে এর মালিকানাধীনে প্রচুর গ্রামীণ হালকা শিল্প স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। (৫) কৃষি ও কৃষকের আয়সীমা বৃদ্ধি পেয়েছিল অনেকগুণ। এর ফলে একদিকে কৃষি উদ্বৃত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভারী শিল্পের ব্যয়ভার বহন এবং অন্যদিকে শিল্পপণ্যের বাজার বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। (৬) গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষক, প্রাক্তন জমিদার, জোতদার এবং কৃষকদের মধ্যে থেকে যারা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর বিরোধী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠছিল তাদের ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। (৭) সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অবকাঠামোর বিপুল উন্নতি হয়। বন্যা, খরা, পোকা ইত্যাদির অভিশাপও কমিউন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রধানত জনশক্তির ব্যবহার করেই দূর করা সম্ভব হয়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত পানি সংরক্ষণ, জীবন উন্নয়ন, পশুপালনসহ কৃষিতে এ কারণেই বাড়তি প্রায় ১০ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। (৮) ব্যাপক কৃষক জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তাদের জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব হয়েছিল। (৯) সামাজিক মালিকানা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং তাদের মতাদর্শগত সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালনা করবার ফলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বিস্তার ঘটে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশেও যা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। (১০) কৃষি রূপান্তরিত হতে থাকে শিল্পে। নতুন রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সংযুক্তি ও নিয়ন্ত্রণও বাড়তে থাকে।'[১]

এই কমিউন ব্যবস্থাই আঘাতপ্রাপ্ত হয় প্রথম।

কমিউন থেকে পারিবারিক দায়িত্ব প্রথা

দেং জিয়াও পিং এর নেতৃত্বাধীন সংস্কার কর্মসূচির শুরুর দিকেই চীন বিশেষজ্ঞ চার্লস বেটেলহেইম লিখেছিলেন, 'কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে

ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যে তাতে কৃষক শ্রমিক ক্রমাগতভাবে উঁচুমাত্রায় কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের ক্রীড়নক হয়ে পড়ছে এবং কর্তৃত্বের ওপর পূর্বের সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।... কৃষিকে এখন শুধুমাত্র পুঁজির পুঞ্জিভবনের বৃহত্তম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।'[২]

তবে কমিউন ভেঙে ফেলা একবারেই সম্ভব ছিল না, সংস্কারও খুব সহজ ছিল না। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক প্রশ্ন ও প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে হয়েছে।[৩] 'সমাজতন্ত্র', 'মাও এর চিন্তাধারা'র নাম দিয়েই সংস্কার শুরু হয় এবং এসব শব্দাবলী বা দাবি থেকে চীনের পার্টি পরেও কখনো সরে আসেনি। যৌথ কৃষি ব্যবস্থাকে অ-যৌথকরণের পথে নাম দেয়া হয় 'পারিবারিক দায়িত্ব প্রথা' "household responsibility system"। এটি হল একধরনের চুক্তিভিত্তিক বা ইজারা ব্যবস্থা। এর অধীনে ক্রমান্বয়ে প্রতি কৃষক পরিবারকে চুক্তি ভিত্তিতে বিভিন্ন প্লট দেয়া হয়। বলা হয়, এই ব্যবস্থায় উৎপাদিত শস্যের নির্দিষ্ট অংশ কর্তৃপক্ষকে দেবার পর বাকিটা কৃষকেরা নিজেরা রাখতে পারবে। এর ফলে ক্ষুদ্রায়তন ও একক কৃষি আবার শুরু হয়, যৌথ ব্যবস্থা ভেঙে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার সূচনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী কেউ কেউ দাবি করেন, 'কোথাও কোথাও উৎপাদন টিমগুলিকে ভেঙে তিন থেকে পাঁচ পরিবার নিয়ে এক একটি ইন্টিগ্রেটেড উৎপাদন ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এগুলোর চরিত্র ছিল মোটামুটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অনুরূপ।'[৪]

তবে, হয়তো প্রতিরোধ ও পরিণতি বিবেচনাতেই, এই সংস্কারে নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে শক্তভাবেই, জমির ওপর ব্যক্তিমালিকানার পুন:প্রতিষ্ঠার চাপ তৈরি হলেও তার আইনী কর্তৃত্ব অনুমোদন করা হয়নি। ব্যক্তি বা পরিবারকে জমি চাষের অধিকার দেওয়া হলেও কখনোই সেই জমির ওপর তার আইনী মালিকানা অনুমোদন করা হয়নি। বিপ্লবপূর্ব পরিস্থিতি ফেরত এসেছে এরকম তাই বলা চলে না। চীনের সংস্কার প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক রতন খাসনবিশ লিখেছেন, '১৯৪৯ সালে চিন দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে তখন এশিয়ার যে কোন পশ্চাদপদ দেশের মতোই সে দেশে সম্পত্তির মূল উৎস ছিল কৃষিজমি। ভূমিসংস্কার, সমবায় আন্দোলন এবং কমিউন ব্যবস্থা গড়ে তোলা-এই তিনটি ধাপের মধ্য দিয়ে চিনে কৃষিজমিতে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটে। কৃষিজমির কেনাবেচার অধিকার সেখানে লুপ্ত হয় এবং কৃষক তার প্রাপ্য পেতে থাকে তার 'ওয়ার্কপয়েন্ট' অর্থাৎ কাজের মাত্রা অনুসারে।...১৯৭৯ সালে সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে চিনে কমিউন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। জমিতে চাষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয় কৃষক পরিবারের হাতে। কৃষিজমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কিন্তু ফিরিয়ে আনা হয়নি। অর্থাৎ জমি যিনি চাষ করছেন, ইচ্ছে করলে সে জমি তিনি বিক্রি করে দিতে পারেন না। কৃষক ইচ্ছে করলে চাষ বন্ধ করে অন্য কোথাও অন্য জীবিকার সন্ধানে চলে যেতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে তার জমি ফেরত যাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে– সে জমি আবার পুনর্বন্টন হবে। এক্ষেত্রে অকশন বা বাজার থেকে জমি কেনা-বেচার ব্যবস্থা নেই। গ্রাম কমিটি তা বিলি করবে সভা ডেকে।...সংস্কার যেটা ঘটিয়েছে তা হল কৃষিপণ্যকে খোলা বাজারে নিয়ে আসা (চিনে ৯৫ শতাংশ পণ্য- শিল্প, কৃষি, সেবাপণ্য-এখন কেনাবেচা হয় খোলা বাজারে)।'[৫]

একই বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ চন্দ্রশেখর ও জয়তী ঘোষ লিখেছেন, 'সংস্কারের প্রথম পঞ্চবৎসরে (১৯৭৯-১৯৮৪) গ্রামীণ জনগণের কমিউন ভেঙে ফেলা হয়েছিল, সমতার ভিত্তিতে পরিবারপিছু জমি ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, 'শস্য প্রথম' এই নীতি বর্জন করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়েছিল, উৎসাহ দেয়া হয়েছিল উৎপাদনের বৈচিত্রকরণে এবং কৃষিজাত উৎপাদনের মূল্য ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। রাসায়নিক সারের সরবরাহও দ্রুত করা হয়েছিল।'[৬] চীনের কৃষি উৎপাদনে সার, কীটনাশক, জিএম প্রযুক্তির ব্যবহারও এরপর দ্রুত বাড়তে থাকে। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে এসবের ভূমিকা কম নয়। সংস্কারে বাজারমুখিতার বিস্তার, বাজারকেন্দ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিই ছিল লক্ষ্য।

এই সংস্কার প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটি হল- পুরনো ভূমি মালিক, সামন্তপ্রভু, বুর্জোয়া ধনপতিদের কাছ থেকে পূর্বে যে জমি ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তার 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে তাদের বিপুল অর্থ প্রদান করা হয়। যার ফলে জনসংখ্যার খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশের হাতে আকস্মিকভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ জমা হয়।[৭]

> ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তে চীন ও যুক্তরাজ্যের যৌথ ঘোষণায় ১৯৯৭ সালের মধ্যে হংকংকে ফেরত দেবার ঘোষণা আসে। 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা' নীতি তখনই ঘোষিত হয়। একই নিয়মে পর্তুগালের কাছ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে ম্যাকাও দ্বীপপুঞ্জ ফেরত পাবার ব্যবস্থা হয়। 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা' একটি নতুন উদ্ভাবন, যার ভিত্তিতে হংকং এখনও পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি হংকংএ দীর্ঘ প্রতিবাদ চলছে অধিকতর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য। তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ হংকংএ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আহবান জানাচ্ছে!

গ্রাম শহরের উৎপাদন সংস্থা

বিপ্লবের পর বিভিন্ন পর্যায়ে এই শহর ও গ্রামের সংস্থা (township and village enterprises) নামের উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল। কমিউন যতোদিন চীনের রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রে ছিল ততোদিন এই প্রতিষ্ঠানগুলো কমিউনের অংশ হিসেবেই পরিচালিত হতো। ১৯৭৮ সালের সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হবার পর থেকে এগুলো ক্রমে ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় নিয়ে যাওয়া হয়। বহুদিন পর্যন্ত মালিকানার ধরন প্রধানত যৌথই ছিল, তবে এর ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগের চাইতে ভিন্ন ছিল। এই পরিবর্তনের পর এসব সংস্থার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে আগের তুলনায় দ্রুত। ১৯৭৮ নাগাদ এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ছিল প্রায় ৩ কোটি, ১৯৯৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যা পৌঁছে যায় ১৪ কোটিতে। উৎপাদনের আর্থিক মূল্য আগে ছিল ৪৯ বিলিয়ন ইউয়ান, তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২ ট্রিলিয়নে। ৮০ দশকেই বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়, এবং এগুলোর শতকরা ৫০ ভাগই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল প্রদেশগুলোতে। এই প্রদেশগুলো হলো গুয়াংডন, ফুজিয়ান, ঝেজিয়াং জিয়াংসু এবং শানডং।[৮] জিয়াংসু এবং শানডং-এর প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল বৃহত্তর।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো আইনত যৌথ মালিকানাধীন হলেও এসব পরিবর্তন কার্যত ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পথে একটি ধাপ হিসেবে কাজ করে। কাগজে পত্রে যৌথ মালিকানা ছিল ঠিকই কিন্তু কর্তৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পরিকল্পনায় কমিউনের মতো সকলের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না। এর সবটাই প্রতিষ্ঠানের

ম্যানেজার সহ আমলাতন্ত্রের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল যা কার্যত ব্যক্তি মালিকানার একটা ধরনই প্রতিষ্ঠা করেছে। মুনাফা অর্জনকে মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান তাই ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের মতোই কাজ করেছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো ৯০ দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বিকাশের পথে ছিল কিন্তু এর পর থেকেই শুরু হয় সংকোচন এবং পতন। যেহেতু প্রথমদিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নানারকম বিধিনিষেধ ছিল, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট সমর্থন পেতো সেহেতু তার বিকাশ ছিল অবধারিত। তাছাড়া স্থানীয় নেতা ও আমলাতন্ত্রের জন্যও বিত্ত ও ক্ষমতার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান ছিল খুবই অনুকূল। ১৯৯৫ সালের পর থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও কমে যায়। কোথাও কোথাও রাষ্ট্রীয় বৈরীতারও মুখে পড়ে এসব প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি সেসময় শুরু হয় ব্যাপক মাত্রায় প্রাইভেটাইজেশন। এই সময় থেকে ব্যক্তি ও বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি পক্ষপাত এবং যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কারণে এগুলো প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এক হিসাবে দেখা যায় শতকরা প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি দেউলিয়া হয়ে যায়।[৯] তারপরও বাজারমুখিতা বাড়ানোর জন্য এগুলোর পুনর্বিন্যাস করা হয় নানাভাবে। একে একে যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয় বা ব্যক্তি মালিকানায় চলে যায়। স্থানীয় কর্মকর্তারাই এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোর মালিক হয়ে বসে।

চীন সরকারের অনুমোদিত প্রকাশনাও এবিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে। ১৯৭৮/৭৯ সালে চীনে গ্রামীণ সংস্থা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ, ১৯৯৫ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ২০ লাখ। ১৯৭৯ সালে শহর ও গ্রামের এসব প্রতিষ্ঠানে শতকরা ২১.৬৫ শহরে এবং শতকরা ৭৮.৩৫ ভাগ গ্রামে যৌথ মালিকানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কাজ করতো। ১৯৯৫ সাল নাগাদ এই যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.৯১ এবং ৫.৪৫। অন্যদিকে একইসময়ে গ্রাম শহরে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার অনেক বেড়ে ৮৮.২৯-এ পৌঁছে যায়।[১০] তার মানে পুরো চিত্রটিই এই কয়বছরে বদলে যায়।

১৯৮৪ সালে এই পরিবর্তন নিয়ে আমার পর্যবেক্ষণ ছিল এরকম: 'কমিউন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতি শিল্পজ-কৃষি অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল। অগ্রসর ব্যবস্থা হিসেবে বৃহদায়তন সমষ্টিগত উৎপাদন প্রচলনের ফলে অবকাঠামোর উন্নয়নও অনেক সহজ হয়েছিল। বাঁধ নির্মাণ, খালখনন, ঘরবাড়ি নির্মাণ, জমির উন্নয়ন, দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়নে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ইত্যাদি তখন সম্ভব হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক উদ্দীপনা ও কাঠামোর উপস্থিতির ফলেই। বর্তমানে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও তা একটি পর্যায়ে নতুন দ্বন্দ্ব সংকটে পড়তে বাধ্য। অবকাঠামো কিংবা ম্যাক্রো পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এখন জনগণের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। মুনাফা যেখানে প্রধান লক্ষ্য সেখানে দুর্নীতি, ফটকাবাজারী, কালোবাজারী ইত্যাদি প্রবণতারও বিকাশ ঘটবে। তাছাড়া সমষ্টিগত থেকে ব্যক্তিগত এবং বৃহদায়তন থেকে ক্ষুদ্রায়তন চাষাবাদের প্রবর্তন নি:সন্দেহে একটি পশ্চাদপসরণ, প্রায় ২৫ বছরে কৃষকদের মধ্যে গড়ে উঠা বিপ্লবী ও সমষ্টিগত চেতনাকে বিনষ্ট করবার একটি প্রক্রিয়া।'[১১]

উৎপাদন কিছুটা নয়, উল্লেখযোগ্য মাত্রাতেই বেড়েছিল,তবে এর ভিত্তি যে আগেই তৈরি হয়েছিল তা মনে রাখা দরকার। ১৯৭৯ থেকে শুরু হয়ে ১৯৯৫ নাগাদ শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয় মালিকানাসহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের কাঠামোগত পরিবর্তনও বেশ স্পষ্ট আকার নেয়।

কিসিঞ্জারের স্মৃতিকথা : মার্কিন-সোভিয়েত বলয়ের ভেতরে ও বাইরে

চীন সম্পর্কে হেনরী কিসিঞ্জারের বিশাল স্মৃতিকথা, অন চায়না-তে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে চীনের আগ্রহের নানাদিক প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরেও, মাও সে তুং এর সময় থেকেই চীন যে নিজের অবস্থান থেকে বিশ্বে একটি ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য একইসঙ্গে নানামুখি কৌশলগত সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেছে তারও কিছু চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিভিন্ন চিঠিপত্র, চীন-মার্কিন নেতৃবৃন্দের আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক সংলাপ ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার হয় যে, 'জাতীয় নিরাপত্তা'র প্রশ্ন তুলে ৭০ দশকের প্রথম থেকেই চীন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছিল। চীন সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য সমাবেশ, কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামের আক্রমণ, ভিয়েতনামকে সোভিয়েত সমর্থন, চীন ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইত্যাদি ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকানোই চীনের অন্যতম অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়ায়। এর পুরো সুযোগই গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের দিয়ে মার্কিনী যুদ্ধ একভাবে সমর্থন পায় চীনের। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার চীনেরও অন্যতম দাবি ছিল।

> এই প্রতিষ্ঠানগুলো আইনত যৌথ মালিকানাধীন হলেও এসব পরিবর্তন কার্যত ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পথে একটি ধাপ হিসেবে কাজ করে। কাগজে পত্রে যৌথ মালিকানা ছিল ঠিকই কিন্তু কর্তৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পরিকল্পনায় কমিউনের মতো সকলের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না। এর সবটাই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার সহ আমলাতন্ত্রের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল যা কার্যত ব্যক্তি মালিকানার একটা ধরনই প্রতিষ্ঠা করেছে।

মার্কিন-চীনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করবার ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। সম্পর্ক স্থাপনের দশবছর পর ১৯৮২ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রেগ্যানকে দেয়া চীন সম্পর্কিত এক নোটে তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, নিজস্ব স্বার্থেই আমাদের চীনকে তৃতীয় বিশ্বে আরও বৃহৎ ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করা দরকার। তারা যতো সফল হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ততোই কম সফল হবে।... ১৯৭২ সালে আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম সোভিয়েত আগ্রাসন বিষয়ে আমাদের অভিন্ন উদ্বেগের কারণে। ১৯৭২-এর তুলনায় সেই বিপদ এখন আরও অনেক বেশি হলেও যা ভবিষ্যতে আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ করবে তা দুইদেশের অর্থনৈতিক পরস্পর নির্ভরশীলতা।'

মার্কিন-সোভিয়েত বলয়ের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে নিজের অবস্থানও শক্তিশালী করবার চেষ্টা করছিল চীন। ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের কাছে দেয়া নথিতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানায়, চীন এমনভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সম্পর্ক তৈরি করছে যাতে একইসঙ্গে 'একদিকে সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক আয়োজনের প্রতি তার সমর্থন থাকছে অন্যদিকে বিশ্বে উত্তেজনা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে অভিহিত করে দুই পরাশক্তির বিরোধকে আক্রমণ করছে। এরফলে চীনের পক্ষে সমান্তরাল দুটো

লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কৌশলগত সম্পর্কের উন্নয়ন, অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্ব ব্লকের প্রতিনিধি হয়ে ওঠা।'

চীনের সাথে ঘনিষ্ঠতা বা চীনের ভূমিকার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের ভেতরে মতভেদ ছিল। প্রেসিডেন্ট রেগ্যানের পররাষ্ট্র সচিব জর্জ শুলজ এর ভাষ্যে এর প্রতিফলন আছে। তিনি বলেছেন, 'সোভিয়েত হুমকি মোকাবিলায় চীনের অপরিহার্যতার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের ফলে দরকষাকষিতে চীন অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। এই সম্পর্ক অবশ্যই হতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে পরস্পরের স্বার্থে। এই কূটনীতিতে চীন তার জাতীয় স্বার্থে ভূমিকা পালন করবে। ...অভিন্ন স্বার্থেই আমাদের চীনা নীতি গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের সাথে জোট আরও জোরদার করতে হবে।'

১৯৮০ দশকের প্রথম দিক থেকেই চীন আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু করে। সম্পর্কের যে মাত্রায় অবনতি হয়েছিল এবং যেভাবে সোভিয়েত বিরোধিতা বা সোভিয়েত আক্রমণের হুমকি সামনে রেখে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তাতে এই মোড় পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়ায়নি। ১৯৮৫ সালে সিআইএ রিপোর্টে দুই পরাশক্তির সাথে চীনের নিজস্ব উপায়ে সম্পর্ক নাড়াচাড়া করবার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। হেনরী কিসিঞ্জার তাঁর অন চায়নাতে এই নোট সম্পর্কে লিখেছেন। এই নোটে বলা হয়েছে, 'উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন সভা, আন্ত:পার্টি যোগাযোগের মাধ্যমে চীন যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছে তা চীন-সোভিয়েত সংঘাত শুরুর পর থেকে আর কখনও দেখা যায়নি।' নোটে আরও বলা হয়েছে যে, 'চীনা নেতারা আবারও সোভিয়েত নেতাদের কমরেড সম্বোধন করা শুরু করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে আবারও সামাজতান্ত্রিক হিসেবে অভিহিত করছেন। চীন ও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়েও কার্যকর আলোচনা করছেন। এই বছরেই মস্কোতে চীনা উপপ্রধানমন্ত্রীর সপ্তাহব্যাপী সফরকালে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।' (পৃ. ৩৯২-৯৩)

> 'জাতীয় নিরাপত্তা'র প্রশ্ন তুলে ৭০ দশকের প্রথম থেকেই চীন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছিল। চীন সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য সমাবেশ, কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামের আক্রমণ, ভিয়েতনামকে সোভিয়েত সমর্থন, চীন ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইত্যাদি ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকানোই চীনের অন্যতম অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়ায়। এর পুরো সুযোগই গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু ততোদিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুমুখি সংকট আরও ঘন হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভাবনীয় বিজয় তখন আসন্ন।

তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের প্রতিবাদ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে আগেই চীন বড়ধরনের ধাক্কা খায় ১৯৮৯ সালের মে মাসে তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনায়। একই বছরের এই মে মাসেই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ চীন সফরে আসেন। তাঁর সফর তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনাবলীর কারণে খুব মনোযোগ পায় নি, পেলেও কিছু হতো না কেননা এর কিছুদিনের মধ্যেই এই গর্বাচেভের নেতৃত্বেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান ঘটে।

তিয়েন আন মেন ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং পরে পলিটব্যুরো সদস্য হু ইয়াও ব্যাং-এর আকস্মিক মৃত্যুর পর। হু পার্টির মধ্যে প্রবল চাপে ছিলেন এবং পলিটব্যুরো সভাতেই ১৫ এপ্রিল তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর কয়দিন পর তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে প্রয়াত এই নেতার স্মরণে আয়োজিত বিশাল জমায়েত থেকেই সরকারের নানা কার্যক্রম ও নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গুঞ্জন শুরু হয়, পরে সেটাই সরব প্রতিবাদে পরিণত হয়। পুরো মে মাস জুড়েই জমায়েত বাড়তে থাকে এবং অবস্থান কর্মসূচি সম্প্রসারিত হতে থাকে। এই বিশাল জমায়েত, এই প্রতিবাদকে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল। মাস ধরে অব্যাহত থাকা অভাবনীয় এই প্রতিবাদ পার্টির কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের পার্টি সংগঠন, সেনাবাহিনী ও সমাজের মধ্যে বড়ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই অস্থিরতার মধ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক রদবদলও ঘটে। প্রতিবাদ দমনে গণমুক্তিফৌজকে একবার আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাঁরা এবিষয়ে কোন ভূমিকা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ক্রমে বেইজিং থেকে এই প্রতিবাদ ৩৪১টি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেইজিং শহরে প্রবেশের সড়ক ও রেলপথ শিক্ষার্থীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। একপর্যায়ে শুরু হয় শিক্ষার্থীদের অনশন ধর্মঘট। অনেক বিতর্ক দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলবার পর ৪ জুন পার্টি ও সরকার বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি দমন করবার কার্যক্রম চালাতে সক্ষম হয়। গণমুক্তিফৌজ মোতায়েন করা হয়।

মাসাধিককাল ধরে চলা বেইজিংএর কেন্দ্রে বাড়তে থাকা সেই প্রতিবাদী বিশাল তরুণ জমায়েত, পার্টির সাথে তাদের সংঘাতের নানা ঘটনা সেসময় অনেকের মতো আমিও পর্যবেক্ষণ করেছি ঢাকা থেকে। কিছুদিন পর আমি এর একটি পর্যালোচনা লিখেছিলাম, তার কিছু অংশ এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। সেই পর্যালোচনায় লিখেছিলাম, "চীনের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের বিকাশ ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বেশ কিছুদিন ধরে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এখানে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছেন কিছু কিছু শ্রমিক কৃষকও। সমাবেশে উপস্থিত সকল মানুষের দাবীদাওয়া অভিন্ন ছিল না। 'গণতন্ত্রের দাবীতে বিক্ষোভ চলছে' এভাবেই বাইরে বিশেষত পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের বিভিন্ন দাবীর মর্মবস্তু অনুসন্ধান করলে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। উপস্থিত একটি অংশের দাবীর মর্মার্থ ছিল পশ্চিমা ধাঁচের ব্যক্তি মালিকানার প্রসার। আর একটি অংশের দাবীর মূল কথা ছিল আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা– যে আমলাতন্ত্র গত কয়েক বছরে বেশ শক্তি লাভ করেছে। আরেকটি বড় অংশের দাবীর মূল কথা ছিল সংস্কারের ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, দুর্নীতি ইত্যাদির অবসান ঘটা। পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনার অধিকার, যা আগে থাকলেও পরে হরণ করা হয়েছিল, তার দাবীও ছিল অন্যতম।"

বস্তুত এই আন্দোলনের ধরন, গঠন, সরকারের ভূমিকা সবকিছুই চীনের জন্য ছিল নতুন অভিজ্ঞতা।

বিভিন্ন টিভি ও সংবাদপত্র থেকে তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি যে চিত্র পেয়েছিলাম তা হল, 'প্রথমদিকে 'লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী একস্থানে জমায়েত হয়েছেন কিন্তু কোথাও কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভাংচুর,

অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেনি। অন্যদিকে সামরিক আইন জারী হয়েছে কিন্তু কোন গুলিবর্ষণ, নির্যাতন গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেনি।...এটা সম্ভব হয়েছিল দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার ছাপ, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের কারণে।...' কিন্তু তাহলে সহিংসতা, রক্তপাত ও হতাহতের ঘটনা কবে কীভাবে ঘটলো? পরিস্থিতির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থেকে তখন যা খেয়াল করেছিলাম তা এরকম, 'একপর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের অবস্থান প্রত্যাহার করতে যাচ্ছেন এবং স্কোয়ার প্রায় খালি হয়ে আসতে থাকে। এই সময়েই ঘটে বিপ্লব পরবর্তী চীনের ইতিহাসের সবচাইতে কলঙ্কজনক ঘটনা। আকস্মিকভাবে সেখানে শুরু হয় হাঙ্গামা, উস্কানিমূলক হামলা, গুলিবর্ষণ। সেসময়ই প্রথম ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে।' (পূর্ণাশা, ১২ মার্চ, ১৯৯০) কত হতাহত হয়েছিলেন তার সঠিক খবারখবর এখনও পাওয়া যায় না। বিভিন্ন তথ্য থেকে বলা যায় যে, শেষ পর্যায়ে এই রক্তাক্ত সংঘাতের ঘটনাবলী স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ থেকে তৈরি হয় নি, এখানে অন্তর্ঘাত এবং উস্কানিরও ভূমিকা ছিল। তারপরও ব্যাপক দমন পীড়নের মধ্য দিয়ে পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে দমনমুখি লোকজনের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রকাশ স্পষ্ট হয়।

তিয়েন মেন স্কোয়ারের এই প্রতিবাদী গণজোয়ারে এবং তাকে ঘিরে ক্ষমতার লড়াইয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে দেং এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পায়। এই বছরই দেং সেন্ট্রাল মিলিটারী কমিশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে নেমে যান। ১৯৯২ থেকে তিনি রাজনৈতিক আনুষ্ঠানিক তৎপরতা থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন। তবে তাতে দেংপন্থীদের উন্নয়ন ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়েনি।

> বিক্ষোভকারীদের বিভিন্ন দাবীর মর্মবস্তু অনুসন্ধান করলে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। উপস্থিত একটি অংশের দাবীর মর্মার্থ ছিল পশ্চিমা ধাঁচের ব্যক্তি মালিকানার প্রসার। আর একটি অংশের দাবীর মূল কথা ছিল আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা– যে আমলাতন্ত্র গত কয়েক বছরে বেশ শক্তি লাভ করেছে। আরেকটি বড় অংশের দাবীর মূল কথা ছিল সংস্কারের ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, দুর্নীতি ইত্যাদির অবসান ঘটা। পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনার অধিকার, যা আগে থাকলেও পরে হরণ করা হয়েছিল, তার দাবীও ছিল অন্যতম।

উঁচু প্রবৃদ্ধির কাল

কয়েক দশক ধরে জিডিপির উঁচু প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চীনের অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রথমদিকে শতকরা ৮/৯, পরে শতকরা ১০/১১ পর্যন্ত। বিশ্বের মধ্যে চীনেই দেখা যায় সবচাইতে উঁচু হারে একটানা জিডিপি প্রবৃদ্ধি। প্রায় তিন দশক ধরে এই উঁচু হার অব্যাহত থাকবার পর গত কয়েক বছরে তা আবার ৬/৭ এ নেমে এসেছে। তবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই উচ্চ হার বাজার স্বয়ংক্রিয়তার মাধ্যমে নয়, পরিকল্পিতভাবেই ঘটেছে। চীনা অর্থনীতির বিকাশ ধারা নিয়ে সরকারি পরিকল্পনা ও প্রক্ষেপণে এই হ্রাসপ্রাপ্তির সম্ভাবনার কথাও আগেই বলা হয়েছিল।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরিবর্তনের গতি ছিল মাঝারি, পরের দশকে তা আরও গতিপ্রাপ্ত হয়। স্থির দামে ১৯৭৮ এর তুলনায় ১৯৯২ সালে জিডিপি বেড়েছে শতকরা ৩০০ ভাগের কিছু বেশি। কৃষি ও শিল্প দুখাতেই উৎপাদন বেড়েছে, তবে জিডিপিতে কৃষির তুলনায় শিল্পকারখানার আনুপাতিক অবস্থান বেড়েছে। স্থির দামে বা একই দামস্তর ধরে তুলনা করলে ১৯৭৮ সালে জিডিপিতে প্রাথমিক খাত বা কৃষির অনুপাত ছিল শতকরা ২৮.৪ ভাগ, ১৯৯২ তে হয়েছে শতকরা ১৬.২ ভাগ। শিল্প কারখানার অনুপাত ১৯৭৮ সালেই কৃষি থেকে অনেক বেশি ছিল, এর অনুপাত ছিল তখন শতকরা ৪৮.৬ ভাগ, ১৯৯২ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫৯.২ ভাগ। টারশিয়ারী বা পরিষেবা খাতের অনুপাত খুব বেশি পরিবর্তিত হয় নি, যথাক্রমে তার অনুপাত ছিল ২৩ এবং ২৪.৬।

তবে এই দুই সময়কালে কর্মসংস্থানের অনুপাতে কৃষি কিছুটা পিছিয়ে গেলেও সংখ্যায় বেড়েছে, এবং কর্মসংস্থানের প্রধান খাত হিসেবে কৃষির ভূমিকাই অব্যাহত ছিল। ১৯৭৮ সালে কৃষিখাতে কর্মসংস্থানের অনুপাত ছিল শতকরা ৭০.৫, ১৯৯২ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ৫৮.৫ ভাগ। কৃষিতে যুক্ত মোট জনসংখ্যা ছিল ১৯৭৮ সালে ২৮ কোটি, আর ১৯৯২ সালে প্রায় ৩৫ কোটি। শিল্প কারখানায় এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭ কোটি ও ১৩ কোটি, শতকরা অনুপাতে এর হার ছিল যথাক্রমে প্রায় ১৭ ভাগ ও ২২ ভাগ। পরিষেবা খাতে যথাক্রমে প্রায় ৫ কোটি ও ১২ কোটি বা শতকরা ১২ ও ১৯ ভাগ।[১২]

২০০০ সালে প্রকাশিত অর্থনৈতিক গতিপথ ও ভবিষ্যৎ নীতি বিশ্লেষণ বিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থে বাজার সম্প্রসারণ আর জিডিপি প্রবৃদ্ধির পথ হিসেবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে গৃহায়ন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণকে। বলা হয়েছে, 'বিনা পয়সা বা সামান্য পয়সায় প্রচলিত গণ গৃহায়ন ব্যবস্থাকে বাজার ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে গ্রামে বিশেষত শহর এলাকায় গৃহায়নের পেছনে খরচ খুবই দ্রুত এবং বিপুল হারে বেড়ে যাবে। ২০১০ সালের মধ্যে তা মোট খরচের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত উঠে যাবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাজারীকরণের মধ্য দিয়েও খরচ অনেক বাড়বে।' তার মানে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বিভিন্ন সর্বজন অধিকারের ক্ষেত্রগুলো বাণিজ্যিকীকরণ করবার মধ্য দিয়ে বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণ হয়েছে, লেনদেন ব্যয় বেড়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির পেছনে এসব বাণিজ্যিকীকরণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

শিল্পায়ন, অবকাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ নতুন কিছু নয়, চীন বিপ্লবের প্রথম থেকেই অর্থনৈতিক নীতির প্রধান দিক ছিল এটি। ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল যতো দ্রুত সম্ভব পুঁজিবাদী বিশ্বের সবচাইতে বিকশিত দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে অতিক্রম করা। এর কারণেই কমিউন ব্যবস্থাকে সাজানো হয়েছিল একই সঙ্গে কৃষি ও শিল্পের বিকাশের যৌথ উদ্যোগের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে। যৌথ উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়নেও বড় সাফল্য দেখা যায় ৬০ ও ৭০ দশকে। পানি ও জমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের সাথে সাথে যৌথ মালিকানায় কার্যক্রমের ফলে শতকরা মাত্র ১২ ভাগ জমি আবাদী হলেও বিশাল জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। শিক্ষা চিকিৎসা সর্বজনের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার ফলে এই বিশাল জনসংখ্যার দেশ অনাহারী ও অসুস্থ মানুষের বদলে সুস্থ ও সক্ষম মানুষের দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ৭০ দশক নাগাদই তাই চীন একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর দেংপন্থী সংস্কার জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্যের দিকে নতুন কিছু যোগ করেনি। মৌলিক ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং কৃষি উৎপাদনে অভূতপূর্ব অগ্রগতির ধারা যা বিপ্লবের কালেই ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সংস্কারপন্থী বা দেংপন্থী অর্থনৈতিক নীতিতে সেটাই অব্যাহত ছিল। পার্থক্য তৈরি হলো রাজনৈতিক,

শ্রেণীগত ক্ষেত্রে। পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো: যৌথ মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং মুনাফামুখিতা ও বাজারমুখিতাকে অর্থনীতির প্রধান ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সর্বাত্মক ব্যবস্থা এবং বহুজাতিক কোম্পানির জন্য বিশেষ ছাড়, রফতানিমুখি উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি।

১৯৮০ ও ৯০ দশকে যখন চীনে এই বাজারমুখি সংস্কার দেশটির প্রধান গতিমুখ নির্ধারণ করেছে তখন সারা বিশ্বজুড়েই বিশ্বব্যাংকীয় কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি চলছে জোরকদমে। বাংলাদেশ ভারতও তার বাইরে ছিল না। এককথায় এর নাম হলো 'নয়া উদারতাবাদী' সংস্কার কর্মসূচি। চীনের সংস্কার কি একইরকম? এটি নিয়ে বিতর্ক আছে। লক্ষ্যণীয় যে,সংস্কারের ফলাফল চীনে যেমন এসেছে বাংলাদেশ বা ভারতের মতো দেশে তেমন হয় নি। তার কারণ সংস্কার ধরনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে পর্যালোচনায় আসবো শীগগিরই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকালে চীন

আগেই বলেছি, তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনার সময় মিখাইল গর্বাচেভ চীন সফর করছিলেন। তখন গর্বাচেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলছিল গ্লাসনস্ত (বা উন্মুক্তকরণ) এবং পেরেস্ত্রোয়কা (বা পুনর্গঠন) কর্মসূচি। এর মূলকথা ছিল সোভিয়েত অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে বাজারমুখি করা, ব্যক্তিগত পুঁজি সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের পরিসর বাড়ানো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সেই অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা। যেহেতু চীনে দেং জিয়াও পিং এর নেতৃত্বে অর্থনীতির বাজারমুখি পুনর্গঠনই চলছিল সেহেতু আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই ধারণা ছিল দুইদেশ একই দিকে যাচ্ছে। চীনের নেতাকে পশ্চিমা দেশ সফরকালে 'চীনের গর্বাচেভ'ও বলা হয়েছে। এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি শাসন ভেঙে পড়ে, পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেও সেই একই লক্ষণ দেখা যায়। দেশের খোদ প্রেসিডেন্টই এখানে পরিবর্তন ত্বরান্বিত করছিলেন।

> দেংপন্থী সংস্কার জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্যের দিকে নতুন কিছু যোগ করেনি। মৌলিক ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং কৃষি উৎপাদনে অভূতপূর্ব অগ্রগতির ধারা যা বিপ্লবের কালেই ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সংস্কারপন্থী বা দেংপন্থী অর্থনৈতিক নীতিতে সেটাই অব্যাহত ছিল। পার্থক্য তৈরি হলো রাজনৈতিক, শ্রেণীগত ক্ষেত্রে।

১৯৯০ সালে গর্বাচেভ নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। সোভিয়েত ইউনিয়নে সংকট এবং পতনের ধ্বনিও বাড়তে থাকে। এর কিছুদিনের মধ্যে পার্টির বাম অংশ গর্বাচেভকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। বরিস ইয়েলিৎসিনকে সামনে রেখে পশ্চিম সমর্থিত সামরিক বেসামরিক আমলা ও নতুন ধনিক গোষ্ঠী সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে। ১৯৯১ সালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে, তার পতন হয়, ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর মিখাইল গর্বাচেভ যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট থেকে পদত্যাগ করেন তখন সেই রাষ্ট্রের আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।[১৩]

পুঁজিপন্থী ও বাজারমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে চীন অনেক এগিয়ে থাকলেও তার পরিণতি যে একইরকম ঘটেনি তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমের শাসকদের মধ্যে এরকম আশাবাদ দেখা গেলেও এবং তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিশেষ নাড়াচাড়া ঘটলেও দেশের ওপর পার্টি কর্তৃত্ব অটুট থাকে। অবশ্য পার্টি নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন রদবদল দেখা দেয়। চীনের ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিণতির অনেক কারণ আছে। একটি বড় কারণ হলো, চীনা পার্টি তার অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন আনছিল তা ছিল পার্টির নেতৃত্বের নিজস্ব হিসাব নিকাশ অনুযায়ী ধীরগতি সম্পন্ন এবং সুপরিকল্পিত। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তনের গতি ছিল খুব দ্রুত এবং সেখানে পার্টির কিছু ব্যক্তির বিশেষ উৎসাহী ভূমিকা থাকলেও পার্টির সামগ্রিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পশ্চিমা বিশেষত মার্কিনী দক্ষ কুশলী তৎপরতাই সেখানে পার্টির মধ্যে নব্য গোষ্ঠী পুষ্ট করে পরিবর্তনের গতিমুখ নির্ধারণ করেছে।

চীনের জন্য পরিকল্পিত যাত্রাপথ তৈরিতে দেংজিয়াও পিংসহ আরও অনেকের সাথে যে ব্যক্তি বিশেষভাবে কাজ করেছেন তাঁর নাম চেন উন। তিনি ১৯৫৩ সালে চীনের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান স্থপতি ছিলেন। মাও সেতুং আমলের মহা উল্লম্ফন পর্বের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি ভারী শিল্পে বেশি গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতি ছিলেন না। আর সাংস্কৃতিক বিপ্লবকালে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৮৯ থেকে পরের কয়েকবছরে পার্টি নেতৃত্বে এবং সংস্কার ধারায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, দেং এর কর্তৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। পার্টির মধ্যে বাজারমুখি ধারার বিরুদ্ধ মত জোরদার হতে থাকে তখন। এই অবস্থা দেং ও দেংপন্থীরা দ্রুত সামলে উঠেন। কোনো আনুষ্ঠানিক পদপদবী না থাকলেও দেং এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯২ সালে দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে নতুন অর্থনৈতিক তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে দেং এর সফরের পর বাজারমুখি সংস্কার যাত্রা আরও গতিপ্রাপ্ত হয়। ১৯৯২ সালে চীন দামনীতি এবং ১৯৯৪ সালে করনীতি সংস্কার করবার পর মধ্য ৯০ দশকে অনেকগুলো বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মাত্রায় ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়।

২০০১ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত হয় চীন। ততদিনে বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য চীন এই সংস্থার সব শর্তপূরণ করেছে। বাজার অর্থনীতির গতি সঞ্চারে আঞ্চলিক ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়। চীনের ৩২টি প্রদেশ, ২৮২টি পৌরসভা, ২৮৬২টি কাউন্টি, ২০ হাজার শহর, প্রায় ১৫ হাজার গ্রাম নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে ভূমিকা রাখে।

চীনের এই প্রতিযোগিতা মূলক বাজার অর্থনীতির যাত্রাকে প্রশংসা করে নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ রোনাল্ড কোয়াস এবং তাঁর সহলেখক নিং ওয়াং চীনকে এক 'বিশাল ল্যাবরেটরী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন, যেখানে বহু অর্থনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে সফলভাবে। তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, নিজের ইতিহাস ও বিশ্বায়নকে একইসঙ্গে গ্রহণ করে চীন পুঁজিবাদে মাত্র যে যাত্রা শুরু করলো তা অন্য দেশের তুলনায় ভিন্ন হবে। এটি শুধু যে চীনের জন্যই কাঙ্ক্ষিত তা নয়, তা পুরো বিশ্বব্যবস্থার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।[১৪] (চলবে)

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anu@juniv.edu

তথ্যসূত্র:

১। আনু মুহাম্মদ: "চীনে সমাজতন্ত্র এবং শ্রেণী সংগ্রাম", সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১৯৮৪।

২। Charles Bettelheim: The Great Leap Backward, MR, March 3, 1978

৩। Zhun Xu: The Political Economy of Decollectivization in China, MR, May 2013. http://monthlyreview.org/2013/05/01/the-political-economy-of-decollectivization-in-china/

৪। এই বিষয়ে সংস্কারের শুরুর দিকে বিস্তারিত জানিয়ে লিখেছিলেন বনবিহারী চক্রবর্তী: "চীনের গণকমিউন ও পুঁজিবাদে পুন:প্রতিষ্ঠা", অনীক, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৮১

৫। রতন খাসনবিশ: "গণচিনের সমাজতন্ত্র', চিন একটি অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন, (সম্পাদনা মইনুল হাসান এবং মানব মুখার্জি) গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৭। পৃ. ১০৮-৯

৬। সিপি চন্দ্রশেখর ও জয়তী ঘোষ: "চিন ও ভারতের অর্থনীতির মিল-অমিল", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

৭। সদ্য চীন ফেরত ফয়েজ আহমদ-এর সাথে আলোচনা। দেখুন: আনু মুহাম্মদ: আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংকট: চীন প্রসঙ্গ, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮২।

৮। Barry Naughton: The Chinese Economy: Transitions and Growth. Cambridge: MIT Press, 2007.

৯। Tony Saich: Governance and Politics of China. New York: Palgrave, 2001.

১০। Li Jingwen (chief editor): The Chinese Economy into the 21st Century, Foreign Language Press, Beijing, 2000.

১১। আনু মুহাম্মদ: "চীনে সমাজতন্ত্র এবং শ্রেণী সংগ্রাম", পূর্বোক্ত।

১২। Li Jingwen: The Chinese Economy into the 21st Century, Forecasts and Policies, Foreign Language Press, Beijing, 2000.

১৩। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভেতরে সংকট এবং তার বিরুদ্ধ শক্তির বিকাশ কীভাবে পতনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তা নিয়ে আমার বিশ্লেষণ আছে অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র; সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা গ্রন্থে, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯৩; ২য় সংস্করণ ২০১৯, সংহতি।

১৪। Ronald Coase and Ning Wang: How China Became Capitalist. Palgrave Macmillan, 2012 edition. January/February 2013 CATO institute paper

তথ্যসূত্র: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, নিউএজ